সুবেদার ওহাবের বিজয়গাথা

‘স্যালুট ক্যাপ্টেন, শেষ সালাম’

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ক্রমে যেন ম্লান হয়ে আসছে রাজনৈতিক বিতর্কে। আত্মত্যাগী যোদ্ধারা বিতর্কের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছেন। ৭ জুন চলে গেলেন অনারারী ক্যাপ্টেন আবদুল ওহাব বীরবিক্রম। মুক্তি যুদ্ধের এই বীরের প্রতি **শাহাদত চৌধুরী’র শ্রদ্ধা নিবেদন...**

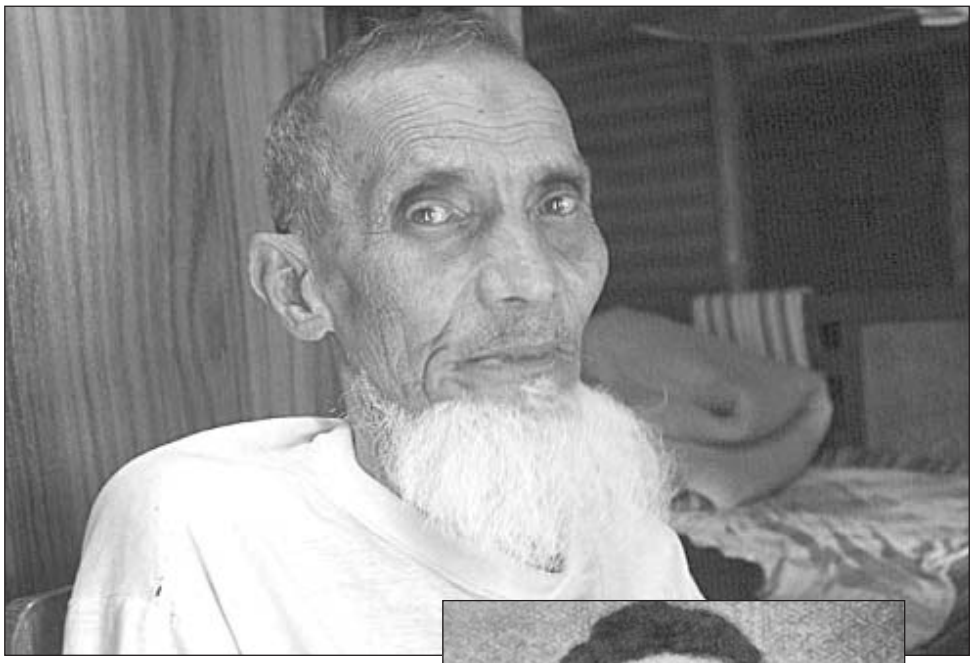

৭ তারিখ রাতেই বাদল ফোন করলো, ‘শাচৌ আপনার জন্য একটা কষ্টের খবর আছে’, একটু থেমে গলা ভিজিয়ে বললো, ‘সুবেদার ওহাব আজ মারা গেলেন।’ পরদিন সকালেই ফোন করলো বাংলাদেশ আর্মির MGO মেজর জেনারেল জামিলউদ্দিন আহসান। বললো, ‘শাহাদত ভাই, খবর তো পেয়েছেন। কি আর বলবো, আপনাকে মনে পড়লো। আইএসপিআর-এর কর্নেল নজরুল এসে গেছে। ওরাও ভাবছে কি করা যায়।’ আমি কর্নেলের সঙ্গে কথা বলে ফোন রাখলাম। ফোন করলো ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা ফতেহ বিষণ্ন এবং অস্থির। বললো, ‘তুমি যাবে না জানাজায়? ডক্টর আখতার ফোন করেছিল। ওরা যাচ্ছে।’ হাবিবুল আলম ঢাকায় নেই। স্কাউটের কাজে গেছে ব্রুনাই

দুদিন আগে। নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু এখন মেক্সিকো। গত রাতে বাচ্চুকে ফোন করেছিলাম খবরটা দিতে। ওর স্ত্রী শিমুল বললো, ‘তুমি তো জানোই ও মেক্সিকো।’ শিমুলকেই বললাম, ‘সুবেদার ওহাব আর নেই।’ ‘কি বললে, সুবেদার ওহাব নেই!’ শিমুল তো ভালো করে ওহাবকে দেখেনি। কিন্তু ওর কণ্ঠ ভেঙে গেল। জেনারেল কবিরকে ফোনের চেষ্টা করলাম, পেলাম না।

আমি অস্থির না। এ বয়সে আর অস্থির হই না। আমি একাত্তরকে খুঁজছি, মেলাঘর খুঁজছি, সুবেদার ওহাবের কোনাবনে পৌঁছাতে চাচ্ছি। আমি তো প্রায়ই চলে যাই সুবেদার ওহাবের কোনাবনে। চার্লি কোম্পানির বাংকারে। কি সুন্দর একটি পুকুর। পুকুরটা নিয়েই ৪র্থ বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানির বাংকার। কোম্পানি কমান্ডে ছিলো লেফটেন্যান্ট জামিল উদ্দিন আহসান, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম গ্রুপের অফিসারদের একজন। সুবেদার ওহাব তাঁর কোম্পানির সুবেদার।

আমরা থাকি মেলাঘর হেড কোয়ার্টারের কর্নেল খালেদ মোশাররফের আস্তানায়। বন কেটে বসত নয়, যুদ্ধের ক্যাম্প পড়েছে। এখান থেকে দেশের ভেতরে পাঠাবার জন্য গেরিলা বাহিনী তৈরি হয় মেজর হায়দারের হাতে। হেড কোয়ার্টার থেকে পরিচালিত হয় ৭টি সাব-সেক্টর। যেখানে আমাদের সরাসরি যুদ্ধ করে মুক্ত রাখতে হয় স্বদেশের মাটি, মুক্তাঞ্চলের পরিধি বাড়াতে হয়। এখানে বসে মুক্তিযোদ্ধাদের পাকাপাকি বাংকার। সেক্টর ২-এ বা ‘কে’ ফোর্সের তিনটি রেজিমেন্টের একটি কোনাবনে। যার নেতৃত্ব ক্যাপ্টেন

গাফফারের। ক্যাপ্টেন গাফফারের হেড কোয়ার্টার একটি পরিত্যক্ত গৃহস্থের বসতবাড়ি। মাটির কয়েকটি ঘর। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দু'একটি টেন্ট।

৪র্থ বেঙ্গলই ২৬ শে মার্চ বিদ্রোহ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং ভারতে চলে আসে। আমরা যখন মেলাঘরে এলাম তখন থেকেই শুনি ৪র্থ বেঙ্গলে যোগ দেয়া পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে আরো দুটো রেজিমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে। এ সময় ৪র্থ বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন গাফফারের সঙ্গে আরেকজনের নাম শোনা যেতো, সুবেদার ওহাব।

যুদ্ধ মানে সব সময় যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নয়। কখনো কখনো অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা। ৪র্থ বেঙ্গল থেকে প্রায় প্রতিদিনই আসতো সাকসেস স্টোরি। আজকালের মধ্যে কসবা দখলে আসবে, এলো দখলে মন্দভাগ। মন্দভাগে বসলো পাকা বাংকার। এবার টারগেট শালদা নদী স্টেশন। ওখানে পাকিস্তানিরা রেল লাইনের উচ্চতাটা ব্যবহার করে ভেতরে খুপরি বানিয়ে বাংকার স্থায়ী করে ফেলেছে। ভেতর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রসর ঠেকানোই তাদের কাজ।

ওই সময় সুবেদার ওহাবের কথা শোনা যেত অনেকটা গল্পের মতো। ৪র্থ বেঙ্গল যখন বিদ্রোহ করে তখনই ও একটি কথা আদায় করেছিল কর্নেল খালেদের কাছ থেকে। 'আমি ভারত যাইতে পারবো না। আমাদের দ্যাশের ভেতর থাইক্যা যুদ্ধ করতে দিতে হবে আমার পল্টন নিয়া।' খালেদ অবাক হন। স্থির দৃষ্টিতে ওহাবকে অ্যাসেস করেন। ওহাব খালেদের এ চাউনি চেনেন। উত্তর দিতে হবে, কেন?

'আমি কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, দ্যাশের জন্য প্রাণ দেবো। আমি দ্যাশের জন্যেই লড়াই করবো, দ্যাশকে মুক্ত করবো বা মরবো দ্যাশের মাটিতে। আমি ভারত যাবো না। বিদেশের মাটিতে আমি মরতে চাই না।'

সুবেদার ওহাব কোনো দিন নাকি ভারত যাননি। শুনতে মনে হয় গল্প। আসলেই তিনি যুদ্ধের সময় গল্প নয়, কিংবদন্তিই হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের মাটি থেকে যাতে যুদ্ধ করতে না হয় সে জন্য সব সময় প্রাণপণ যুদ্ধ করে, বাংকার করার জন্য দেশের মাটি দখলমুক্ত রেখেছেন।

ফোন করলো অবসরপ্রাপ্ত মেজর কামরুল। উত্তেজিত কণ্ঠ। ও বিজয় কেতনের সঙ্গে ছিল। বললো, দু'একজন জীবিত ব্যক্তির ওপর প্যানেল রাখা হয়েছে। তার মধ্যে সুবেদার ওহাব একজন। কি করা যায়? বললাম, ২০০০-এর জন্য আমি লিখছি। তুমি একটা লেখা অন্য কোথাও দাও। আমাদের যাদের ঠিকানা '৭১-এ মেলাঘর, তারা চাচ্ছি ওহাবকে নিয়ে কি করা যায়। অথচ মানুষটি বীর উত্তমও নয়, বীর বিক্রম।

জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরীকে ফোন করলাম। কিন্তু তার নম্বরটা নো রিপ্লাই। জেনারেল আমিন '৮১ সালে সুবেদার ওহাবের ৬টি যুদ্ধের ওপর লিখেছিলেন আমার সম্পাদিত বিচিত্রায়। জেনারেল আমিন অনেক খুঁজে তার ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন বান্দরবানে, জেনারেল আমিনের পোস্টিং তখন সিলেট। আমি প্রায়ই ফোন করে জেনারেলকে বিরক্ত করি, পেয়েছেন সুবেদারকে? একদিন জেনারেল জানালেন পাওয়া গেছে। তার মেয়ের বিয়ের পরে দেখা করবে, এসে জানিয়ে গেছে।

যাক, পাওয়া গেল। জেনারেল আমিন তাকে নিয়ে যান ব্রাহ্মণবাড়িয়া। যুদ্ধের স্পটগুলো দেখেন। স্থানীয় লোকেরা অবাক হয়ে বয়স্ক ওহাবকে দেখে, এতো একজন সাধারণ মানুষ! তারা যুদ্ধের সময় মনে করতো সুবেদার ওহাব জিনের সাওয়ার হয়ে থাকেন, তাকে দেখা যায় না। লোকে বলতো ফ্যান্টোমাস বাহিনী। জেনারেল আমিনের লেখাগুলো পরে আর্মির পাঠ্যসূচিতে গিয়েছিল যুদ্ধের ব্যতিক্রম হিসেবে।

মানুষটা দেখতে সাধারণ। যোদ্ধা হিসেবে শুধু অসাধারণ নয়, মানুষ হিসেবেও।

খালেদ মোশাররফ টেলিগ্রাফিক নিউজগুলো দেখতেন অবসরে। একদিন দেখতে দেখতে হাসছেন। বললেন, 'ওহাবের কান্ড। গত রাতে চিটাগাং রোডে এম্বুশ করেছিল। পাকিস্তানিদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

বলতেন, 'হি ইজ কানিং লাইক ফক্স, ব্রেভ লাইট লায়ন!'

সব কথাই গল্পের মতো। কিন্তু আমি ঢাকায় থাকি। মাঝে মাঝে মেলাঘর যখন যাই, থাকতে হয় বেশির ভাগ সময় খালেদ মোশাররফের কাছাকাছি। একদিন আমাকে নিয়ে একটি সাব সেক্টর ঘুরে বিকেলের দিকে কোনাবনে নামলেন। ওখানে কিছু একটা ঘটেছে এটা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু এসব নিয়ে আলোচনা প্রায় নিষিদ্ধ। গাড়ি থেকে নামার আগে কয়েক কথায় খালেদ বলে রাখলেন ঘটনাটা।

বিরোধটা সুবেদার ওহাবের সঙ্গে এক অফিসারের। তরুণ এই অফিসারের অর্ডার মানতে রাজি হচ্ছে না সুবেদার ওহাবের কোম্পানি। কারণ কোম্পানির সামনে অফিসার অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করেছিল। যা ট্রুপ আপত্তিকর মনে করেছে। ওহাবের বিরুদ্ধে সাব-অর্ডিনেশনের অভিযোগ। এটা বড় ধরনের অফেন্স। কোনাবনে আজ বিচার হবে। দু'জন আগেই বক্তব্য জানিয়েছে। দু'জন এখন মুখোমুখি বলবে, বলবে ক্লোজড ডোরে। খালেদ মোশাররফ প্রথমে বসলেন ক্যাপ্টেন গাফফার, ক্যাপ্টেন কবির এবং অন্য অফিসারদের সঙ্গে। অভিযুক্ত তরুণ অফিসার এলেন। তিনিও কিছু বললেন, বুঝলাম অফিসারের মনোবল তত শক্ত নয়। বয়স কতই বা হবে, ২০ বছর। অন্যদিকে এক কিংবদন্তি, চল্লিশোর্ধ্ব সুবেদার। এমন সময় সুবেদার ওহাব এলেন। এই প্রথম চাক্ষুষ দেখলাম সুবেদারকে। সুবেদার ওহাব হাতে এসএমজি রাখেন না, রাখেন এলএমজি। এটাই তার সার্বক্ষণিক অস্ত্র। ছোটখাটো মানুষ, থুতনিতে একটু দাড়ি। উঁচু করে লুঙ্গি পরা, ধূসরিত শার্ট, খালি পা। এটাই তার এখনকার রেজিমেন্টাল পোশাক। চেহারাটা একটু ক্ষিপ্ত। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। মাটির কুঁড়েঘরের অল্প আলোয় প্রবেশ করলো রোগাটে ছোটখাটো মানুষটা। তার আকারের চেয়ে অস্ত্রটা বড় মনে হলো। খালেদ মোশাররফকে দেখে 'সান' করে ঘরের একটা খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে ইমোশনাল হয়ে পড়লেন। একটি চেয়ার ছিল সেটাতে না বসে মাটিতে বসে পড়লেন ঠিক নয়, ভেঙে পড়লেন যেন।

খালেদ বললেন, 'সাব চেয়ারে বসেন।'

'স্যার, আমরা একটা মানুষ! আমাদের আবার সম্মান!' আরো কিছু বলার আগেই খালেদের তীব্র চেনা দৃষ্টি তাকে থামিয়ে দিলো। খালেদ মোশাররফ অস্পষ্ট উচ্চারণ করলেন, 'সাব!'

সুবেদার উঠে দাঁড়িয়ে আবার 'সান' করে চেয়ারে বসলেন। বিচার শুরু হলো। বিচার হবে দরজা বন্ধ অর্থাৎ খালেদ এবং ওরা দু'জন ছাড়া কারো থাকার কথা নয়। আমার উপস্থিতি অফিসার চাচ্ছিলেন না। সেটি তিনি ইঙ্গিত করলেন। খালেদ মোশাররফের ইঙ্গিতটি না বোঝার কথা নয়। কিন্তু কিছু বললেন না। সুবেদার তার কথা শুরু করলেন তীব্র অভিযোগের কণ্ঠেই। অফিসার তখন খালেদকে মনে করিয়ে দিলেন, আমার উপস্থিতির কথা। এবার খালেদ আমার দিকে তাকিয়ে বের হয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

বিচার শেষে অফিসারকে উঠিয়ে নেয়া হলো। সবাই যেন জানতো এটাই হবে। এটা স্বাভাবিক সময় নয়। এখানে বৈরী সৈনিক নিয়ে যুদ্ধ হবে না। আমার মনে হয়েছিল

সুবেদারের অপ্রতিরোধ্য গতি কেউ রোধ করতে চাচ্ছিলেন না।

চিওরায় পাকিস্তানি গানবোট অ্যাটাক করলো সুবেদার। বোধহয় এ ঘটনার পরপরই। সিঙ্গাইড় বিলের উজানে সুবেদার ওহাব পাকিস্তানি গানবোট আক্রমণ করেছে মাত্র ২৫ গজ দূরত্ব থেকে। পাকিস্তানিদের অস্ত্র হাতে নেয়ার সুযোগ দেয়নি সুবেদার ওহাব।

কর্নেল খালেদ খবর শুনেই রওনা হলেন। আমি আছি তার সঙ্গে। আমরা পৌঁছালাম ভাটির দিকে। তখন দেখি উজান থেকে লাশ ভেসে আসছে। কৌতূহলী আমরা। কর্নেল খালেদ লাশগুলো দেখে খুশি হলেন না। বললেন, 'প্রতিটি যুদ্ধে ক্যাজুয়ালটি কিন্তু বাঙালিরাই। এই দেখ, এগুলো বাঙালির লাশ। পাকিস্তানি পোশাক পরিয়ে হাতে থ্রি নট থ্রি দিয়ে দিয়েছে। আর ওদের ব্যবহার করছে স্যান্ডব্যাগ হিসেবে। প্রথম গুলিটা ওরাই খাচ্ছে।'

কর্নেল খালেদের মন খারাপটা ঠিক হয়ে গেল। লাশ আসছে পাকিস্তানিদের! এ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় খবর হলো ক্যাপ্টেন বোখারীকে হত্যা করা হয়েছে। এই ক্যাপ্টেনের কাজ ছিল কুমিল্লা শহরে হিন্দু বাড়িতে হানা দিয়ে মেয়েদের তুলে নেয়া। গ্রামেও অসংখ্য মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল এই পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন। রেপের গল্প বলে বাহাদুরি নিতো সঙ্গীদের কাছে। ওর লাশ আমি দেখিনি, শুনেছিলাম ৬৭টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে তার লিঙ্গাঞ্চল প্রায় উড়ে গিয়েছিল।

'৭১-এর অক্টোবরে কর্নেল খালেদ শালদা নদী স্টেশন ৪র্থ বেঙ্গলের পুরো শক্তি দিয়ে আক্রমণ করলেন। এই স্টেশনের ব্রিজটা দখলে রাখা দরকার। কসবা মন্দভাগের পর শালদা নদী স্টেশন। তারপর নয়নপুর। কর্নেল খালেদ কুমিল্লা শহরের কাছাকাছি পৌঁছাতে চান। তার মত হলো, আমরা যত কাছে যাবো, পাকিস্তানিরা তত ইনসিকিওর ফিল করবে। খবর পাওয়া যাচ্ছে পাকিস্তানিরা গুটিয়ে শুধু ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে থাকতে চাইছে। অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ রচনা করছে।

এই যুদ্ধে কর্নেল খালেদ মোশাররফের কপালে এসে বিদ্ধ হলো একটি স্প্লিন্টার। স্কাল ভেদ করে ভেতরে রয়ে গেল। হেলিকপ্টারে তাকে তুলে নেয়া হলো। কর্নেল খালেদবিহীন হলো সেক্টর-২। সেদিন ছিলাম 'লড়াই'-এর কাজে আগরতলা। অবসরে আমি একটি নিউজ লেটার সম্পাদনা করতাম মেলাঘর থাকলে, নাম 'লড়াই'।

কর্নেল খালেদবিহীন মেলাঘর হেডকোয়ার্টারে অনেক রদবদল হয়ে গেলো। কে-ফোর্স হেড কোয়ার্টার অন্যত্র গেলো। আমাদের ঢাকা থেকে উইড্র করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের প্রথমে। আমাদের বাড়িসহ ২১ বাড়ি রেইড হবার পর আমাদের বাহিনী ফেরত নেয়া হয়। এদের বলা হলো ঢাকা নর্থ। এই সময় ঢাকা সাউথে পাঠানো হলো মানিক-বাচ্চুদের বাহিনী। আমি ঢাকায় থাকলে এক ধরনের ব্যস্ততা, সেক্টরে গেলে কর্নেল খালেদের সার্বক্ষণিকভাবে সঙ্গে থাকতে হতো। নিজেকে বলতাম ব্যাটম্যান। এখন আমার কোনো কাজ নেই।

এদিকে শহীদুল্লাহ খান বাদলকে আগেই কোলকাতা হেড কোয়ার্টারে ডেকে নেয়া হয়েছে। কারণ তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস। বাদলের জায়গায় এফএফ মুভমেন্টের দায়িত্বে মেজর হায়দারের সহযোগী হলো হাবিবুল আলম ও বাসার। আমি জীবনে এমন একাকী ও ফ্রাসট্রেটেড ফিল করিনি। ঢাকা যাবার পথ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে ঢাকা যাওয়া ঠিক না। মা-বাবা, বোনেরা কোথায় আছে তাই তো জানি না। আগরতলা গিয়ে থাকলাম দু'দিন। ওখানে থাকতে হাতে পয়সা লাগে। এদিকে জমানো ঢাকা থেকে নেয়া পয়সাও শেষ।

হাবিবুল আলমের সঙ্গে পরামর্শ করে চললাম ৪র্থ বেঙ্গলে। ওখানে ডা. ক্যাপ্টেন আখতার ও ক্যাপ্টেন কবির বন্ধু মানুষ। ক্যাপ্টেন কবির এডজুটেন্ট, দু'জনকে ৪র্থ বেঙ্গলের সৈনিক বানিয়ে দিলো। ফ্রিডম ফাইটার থেকে, মুক্তি ফৌজ। এতে সুবিধা হলো হাত খরচের একটা টাকা পাওয়া যায়। সঙ্গে ক্যাপ্টেন কবির দিলো সোয়েটার, জঙ্গলবুট ও পশমি মোজা। শীত নেমেছে। অনেকগুলো সমস্যার সমাধান হলো। ক্যাপ্টেন কবির বলতো, 'তুমি, আমার সঙ্গে থেকে যাও।'

থেকে গেলাম। কবির তার টেন্টে আমার থাকার ব্যবস্থা করলো। পাড়ার ছেলে, ছোট ভাই ফতেহ'র বন্ধু আখতারের সঙ্গে এরই মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে। ডা. আখতারই আমাকে ফ্রন্ট লাইনে নিয়ে গেলো।

ওখানে দেখা হলো আবার সুবেদার ওহাবের সঙ্গে। পরিচয় হলো নবাগত লেফটেন্যান্ট জামিল আহসানের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। কালো ফ্রেমের ভারী লেন্সের চশমা সবচে' আগে চোখে পড়ে। এদের পরিচয় ফার্স্ট মূর্তি। ডা. আখতার ও লে. জামিলের সঙ্গে বাঙ্কারের ভেতর ও চারদিকটা দেখছিলাম। তখন যুদ্ধ চলছিল না। গোলাগুলি না থাকলে সৈনিকরা অস্ত্র পরিষ্কার করে, ভালো একটু খাওয়া দাওয়া হয়। দু'একজন পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ফ্রন্টাল ফাইট মানে আগে বুঝতাম তা হলো হলিউডি ছবিতে যা দেখেছি। এখানে একমাত্র লে. জামিলের পরনে ছিলো খাকি ধরনের পোশাক, ইউনিফর্ম নয়। অন্যরা সুবেদারের মতো লুঙ্গি এবং গেঞ্জি বা শার্ট। খালি পা। কেউ কেউ ক্যাপ্টেন গাফফারের মতো হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি পরেছে। কারো কারো পায়ে মোজা ছাড়া জঙ্গলবুট।

আমি ডা. আখতারের একটি বাঙ্কারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম পাকিস্তানিদের অবস্থান। পরিষ্কার দেখা যায় ওদের চলা ফেরা। দুই বাঙ্কারের মাঝে একটা ফসলি জমি। তখন ধান কেবল কেটে নিয়েছে। আমি ভালো করে এমজি 'সাইটে' চোখ রাখলাম। ডা. আখতার বললো, সাবধান। ওদের এমজি এই পয়েন্ট তাক করা আছে। কথা বোধহয় হলো না। শব্দের আগেই আমার গালে যেন হাওয়া লাগলো। এমজি পাশ থেকে বাঙ্কারের পিপ হোলের মাটি খসে পড়লো। ডা. আখতার আমাকে টান মেরে সরিয়ে আনলো। বললো, 'ওরা আপনাকে টার্গেট করেছে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ'। ডা. আখতার বললো, 'আপনার চশমা। ওদের বায়নাকুলারে আপনার চশমা সাইন করেছে।'

চার্লি কোম্পানি ততক্ষণে এলার্ট হয়ে গেছে। ধমাধম যার যার পজিশন নিয়ে নিয়েছে। দেখি সুবেদার ওহাব দাঁড়িয়ে বাঙ্কারের মুখে। ব্যাপার বুঝে হাসলেন।

কোম্পানির একটি হিন্দু ছেলে, এফএফ ছিল, নাম অক্ষয়। অক্ষয় ছিল অস্থির ও দুষ্টু। আমি অক্ষয়ের সঙ্গে জুটে গেলাম। গোলাগুলি না থাকলে যোদ্ধারা অস্ত্র পরিষ্কার করে, নিয়মিত কিছু কাজ আছে সেগুলো করতে থাকে। অক্ষয় হাতে একটি চোঙ্গা নিয়ে বাঙ্কারের ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তানি বাঙ্কারের দিকে ফিরে অশালীন গাল দিয়েই নিচু হয়। ওরাও চোঙ্গা হাতে গালিগালাজ করে। একবার বোধহয় অক্ষয়ের গালটা বেশি হয়ে গিয়েছিল। গুলিতে উত্তর এলো, এলএমজি ফায়ার। অক্ষয় গাল দিতো অশুদ্ধ উর্দু ও আরো অশুদ্ধ পাঞ্জাবি ভাষায়। পাঞ্জাবি গালাগালি সুবেদার ওহাব ও অন্যান্য অনেকে জানতো। এটা পাকিস্তান পোস্টিং-এর সময় শেখা। গুলি বিনিময়ের আর অনেক সময় পাকিস্তানিদের ফ্রিকোয়েন্সি ধরে ফেলতো, সুবেদার ওহাব পাঞ্জাবিতে গাল দিতো সেখান থেকে অক্ষয় রপ্ত করেছে। তবে একটি গাল এখনো মনে আছে। সুবেদার ওহাব '৬৫-র যুদ্ধে শিয়ালকোট সেক্টরে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ

করেছিল। গালাগালের সময় সুবেদার প্রায় বলতো 'সুয়ারকা বাচ্চা, শিয়ালকোটমে তেরা মা কা ইজ্জদ বাঁচায়া' ...ইত্যাদি। পাকিস্তানিরাও আমাদের রেডিওতে ঢুকে পড়তো। গাল দিতো। সুবেদার ক্ষেপে যেতো ওরা যখন বলতো, ইন্দিরাকা পুত। সুবেদার ওহাবের অশুদ্ধ পাঞ্জাবি আরো শাণিত হয়ে উঠতো। পরের দিন একটা খেলা আবিষ্কার করলাম। সেদিন আমার পরনে ছিল মাস্টার্ড রঙের টি-শার্ট। আমি কারো সঙ্গেই কথা বলছি হঠাৎ ফায়ার। আমি গাছের পাশে ঝোপ ঝাড়ের সঙ্গেই ছিলাম। একজন সৈনিক মার্ক করলো, আপনার গেঞ্জি ওদের চোখে পড়ছে। ওটা বদলে ফেলেন। তখনই বদলানো হলো না। আমি বাঙ্কারের ওপরে উঠে বসি ওরা গুলি করে। আমার সাহস বেড়ে গেলো। আমি গড়িয়ে বাঙ্কারের ডান দিকে যাই ওরা গুলি করে। আমি লাফ দিয়ে নিচে নামি আবার উঠি। একজন নায়েক এসে বললো, কি করতাছেন স্যার। বললাম, ওদের গুলি খরচ করছি!

চার্লি কোম্পানির খাবারটা ভালো না। একদিন ডা. আখতারের সঙ্গে গিয়েছিলাম আলফা কোম্পানিতে। কোম্পানি কমান্ডার লে. মমতাজ। ওখানে খাওয়াটা বেশ ভালো। বড় মাছ ছিল। অতিথি পেয়েই হয়তো ওটা হয়েছিল। চার্লি কোম্পানির ছোট মাছ খাওয়ার রহস্য কি জানা গেল লে. জামিলের কাছ থেকে। সুবেদার ওহাব পুকুরের মাছ ধরতে দেবেন না। কারণ পুকুরের মালিকানা বসত বাড়ি ছেড়ে যাওয়া মানুষের। এ তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সুবেদারের কাছে এটা এখন পবিত্র আমানত। মাছ খেতে চাইলে বিল নদী থেকে ধরে আনতে হবে। নদীতে জাল ফেললে কাচকি ও মলাই পাওয়া যায়! অথচ বাংলাদেশ থেকে পাট বোঝাই নৌকা থেকে ট্যাক্স আদায় করে চার্লি কোম্পানি। সুবেদার হাজার হাজার টাকা জমা দেয় হেড কোয়ার্টারে। এ ট্যাক্স কালেকশনের দায়িত্ব কর্নেল খালেদ সবাইকে দিতেন না।

একদিন সকাল থেকে দেখলাম এমজি বাঙ্কারের সামনে টাল হচ্ছে পেটি পেটি এমজি রাউন্ড। আমরা গেরিলা যুদ্ধে জানি, সেখানে স্টেনে হয়তো অতিরিক্ত একটা বা দুটো ম্যাগাজিন সঙ্গে থাকে। যুদ্ধে এসে এতো বুলেট একত্রে দেখিনি। আমাদের গুনে গুনে বুলেট ইস্যু করা হয়। আর পেটির পর পেটি একখানে টাল হচ্ছে। আর একদল বসে গেছে সেগুলো বেল্টে পরাতে। সব অস্ত্র চক চক করছে।

কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জামিল তখন তরুণ, একেবারেই বাচ্চা ছেলে। ওর অধীনস্থ সৈনিক হয়েও আমি নাম ধরে ডাকি। ও বলে শাহাদত ভাই সুবেদার ওহাব আমাকে 'স্যার' বলে কারণ আমাকে ও দেখেছেন কর্নেল খালেদের সঙ্গে। আমি সুবেদারকে ডাকি 'সাব' বলে। এটাই রীতি ব্রিটিশ আমল থেকে।

রাতে এলেন লেফটেন্যান্ট জামিল, সুবেদার ওহাব, লে. মমতাজ ক্যাপ্টেন গাফফারের টেন্টে। আমিও থাকলাম। এলেন ক্যাপ্টেন পাশা। এলেন অন্যান্য কোম্পানি কমান্ডাররা। ফার্স্ট মুজিব ব্যাটারি বসেছে কোনাবনেই জঙ্গলের ভেতর। কমান্ডার ক্যাপ্টেন পাশা। অবস্থানের গোপনীয়তা রাখা হচ্ছে।

কথায় বোঝা গেলো ভোর চারটায় অ্যাটাক। পাশা আমাকে চেনেন না। ক্যাপ্টেন গাফফারকে জিজ্ঞেস করলো পরিচয়। ক্যাপ্টেন গাফফার বললেন, হেডকোয়ার্টার থেকে এসেছে। তখন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারিত হচ্ছিলো প্রতিটি ইউনিটের মধ্যে। আমি উঠে এলাম।

সময়টা জানা ছিল। আমার ঘুম আধা ভাঙা ছিল। ফায়ার ওপেন করলো ফার্স্ট মুজিব ব্যাটারি পাকিস্তানিদের চমকে দিয়ে। ওরা হতচকিত হবে মুক্তিবাহিনীর নিজস্ব আর্টিলারি, খবর পেলেই। তিন বাহুতে অ্যাটাক রচিত হয়। জামিল-ওহাব একটি পল্টন নিয়ে এগুবে মসজিদের দিকে, অন্যদিকে নায়েব সুবেদার শহীদ, সবচে' ডান দিকে নায়েব সুবেদার বেলায়েতের ট্রুপ। শহীদ পাক আর্মির মার্কড্ হয়ে গোলার মধ্যে পড়ে যায়। জামিল-ওহাবও বেলায়েতকে এগিয়ে যেতে বলে উঠে আসে বাঙ্কারে, কভার দিতে হবে বেলায়েতকে।

বেলা বাড়তেই বোঝা গেলো ৪র্থ বেঙ্গল কর্নেল খালেদ আহত হবার প্রতিশোধ নেবে। খালেদের ইচ্ছে পূর্ণ করবে, শালদা নদী দখল করবে। লে. জামিল কথা কম বলে, কিছু জিজ্ঞেস করলে মৃদু হাসে। একটি চেয়ারে বসা জামিল। মাঝে মাঝে উঠে বায়নোকুলারে শত্রু বাঙ্কার দেখছে, সুবেদার ওহাবের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করা যাচ্ছে না। সব দিক থেকে মেশিন গান চলছে। সুবেদার ওহাব বারবার আলফা কোম্পানিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ফায়ার থামালে চলবে না। আবার মুজিব ব্যাটারিকে ফায়ার কারেকশন দিচ্ছে। সঙ্গে কমিনিকেট করছে, কোঅর্ডিনেট করে নিচ্ছে। পুরো কমান্ড বাংলায়। যেমন স্যার, আপনারা কাছাকাছি ফায়ার করছেন। এবার পঞ্চাশ গজ ডাইনে, ২৫ গজ সামনে মারেন। না, না, স্যার বেশি সামনে চলে গেল... ইত্যাদি। মুজিব ব্যাটারির ফিল্ডগান প্রায় টার্গেটে পৌঁছে গেল। উত্তেজিতভাবে সুবেদার ওহাব সব ফায়ার ওপেন করলো, অন্যান্য কোম্পানিকেও সেই নির্দেশ দিলো। দেখলাম লে. জামিল ও সুবেদারের বায়নোকুলারের দৃষ্টি অন্যত্র। এবার বুঝলাম নায়েব সুবেদার বেলায়েত নেমে গিয়েছিল ধান ক্ষেতের ভেতর, ২০/২৫ জনের ট্রুপ নিয়ে আইল ধরে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আইলটা উঁচু। ট্রুপের সঙ্গে আছে গ্রামের কিছু ছেলে। ১০/১২ ফুট লম্বা রিকয়ারলেস রাইফেলটিকে আইলের পাশে ফেলে একটু একটু করে এগুচ্ছে। আজ আমাদের মর্টারগুলোও চমৎকার কাজ করছে। এ সময় ফিল্ডগানের ফায়ার বাড়িয়ে দেয়া হলো। মর্টারের দিকে তাকিয়ে গ্রাউন্ড ফায়ার জোরদার করতে বললেন সুবেদার। পাকিস্তানিদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ধরে পাঞ্জাবি ভাষায় গালি দিতে লাগলো সুবেদার ওহাব, একই সঙ্গে বাড়িয়ে দিলো ফায়ারিং। পাকিস্তানিরা মাথা তুলতে না পারে, দেখতে না পায় সুবেদার বেলায়েতের অগ্রগামিতা। বেলায়েত পৌঁছে গেল শালদা নদীতে। ওখানে নৌকা রাখা ছিল। নৌকায় তুলে ফেলা হলো RR। একটানে পার হলো RR। অন্যরা কম পানিতে সাঁতার দিয়ে উঠে গেল ওপারে। ততক্ষণে পাকিস্তানিরা দেখে ফেলেছে বেলায়েত বাহিনীকে। কিন্তু নায়েব সুবেদার বেলায়েত একেবারে বাঙ্কারের পাশে পৌঁছে গেছে। তখন সৈনিক সিরাজ বিদ্ধ হলো গুলিতে। বেলায়েত জানে আরো ক্যাজুয়েলটি হবে। সবাই মারা যেতে পারে! লক্ষ্য করলাম লে. জামিল সুবেদার ওহাব হুঁশে ফেরত এলেন। 'ওরা পৌঁছে গেছে, স্যার।'- সুবেদারের চিৎকার।

পরিকল্পনা ছিল কোনো মতে স্টেশন বিল্ডিং-এর পেছনে পৌঁছাতে পারলে পাকিস্তানি ফায়ারে ওদের বাধা দিতে পারবে না। বেলায়েত ফিট করলো RR। পঁচিশ গজ দূরত্ব থেকে ফায়ার করছে বেলায়েত। RR শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু রেঞ্জ কম। দূরত্ব ২৫ গজের মধ্যে না হলে এফেকটিভ হবে না। এখন ওটা পঁচিশ গজেরও কাছে। তখন চার্লি আলফার সব অস্ত্রই ফায়ার করছে। আমাদের লক্ষ্য পাকিস্তানিরা RR আক্রমণ না করতে পারে। 'ইয়া আলী' ধ্বনি দিয়ে RR-এর ফায়ার শুরু হলো। পরপর দশ-এগারোটা। আরো বেশি গোলা নেয়া হয়েছিল। প্রয়োজন হলো না। আমরা শুনলাম বেলা তিনটার দিকে জয় বাংলা, জয় বাংলা... বিশজনের একত্রিত কণ্ঠস্বর। বিজয়ীর হুঙ্কার।

এই শিবিরেও পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ওদের সঙ্গে গলা মিলালাম আমরা। সশস্ত্র ট্রুপ নেমে গেল বাঙ্কারের দিকে। খুব দ্রুত, কিন্তু নিচু হয়ে সাবধানে। প্রতিটা পাকিস্তানি বাঙ্কারে গ্রেনেড ভেতরে প্রথমে ছুঁড়ে দিয়ে চার্লি কোম্পানি দখল করতে লাগলো একের

পর এক বাঙ্কার ক্ষিপ্র গতিতে।

টাল হলো লাশ। গ্রামের লোকরা বাঁশে তুলে লাশ ও জখমিদের নিয়ে এলো। রাজাকার কয়েকজন পাওয়া গেল।

রাজাকার পেয়েই ক্যাপ্টেন গাফফার একজনকে হাতের তালু দিয়ে নাকে প্রচন্ডভাবে মারতেই লোকটি ধরাম করে পড়ে গেল। গাফফার শুধু উচ্চারণ করলেন, 'রাজাকারের বাচ্চা!' আঘাতটা কেন তা ঘৃণিত উচ্চারণেই বোঝা গেল। ক্যাপ্টেনই পরে বললেন, পাকিস্তানি লাশ দাফন করা হবে। জীবিতদের গুলি করে মারা হবে।

ক্যাপ্টেন ডা. আখতার বললেন, ওদের কয়েকজনের চিকিৎসা করতে হবে।

৪র্থ বেঙ্গলের নিয়ম রাজাকার ধরা হলে তাকে গাছে ঝুলিয়ে পিটিয়ে মারা হয়। কারণ সে বিশ্বাসঘাতক। জাতির সঙ্গে বেইমানি করেছে। পাকিস্তানিটা সৈনিক। সে তার দেশের জন্য যুদ্ধ করছে। সে জন্য তার হবে সৈনিকের মৃত্যু! অর্থাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া। রাজাকারের জন্য গুলি খরচ করা যায় না। 'শিল্পী, আমাদের গুলির অনেক দাম।' ক্যাপ্টেন গাফফার আমাকে অনেক সময় এই নামে ডাকতেন। কখনো বলতেন সাংবাদিক।

রাতে আমি এম্বুলেন্স নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ফিল্ড হাসপাতাল ও মেলাঘরের উদ্দেশে। হাসপাতালে নামাবো পাকিস্তানি তিন-চারজন জখমি। সঙ্গে দুটো লাশ নিয়েছি বড়সড় দেখে মেলাঘরের জন্য। ৪র্থ বেঙ্গলের তরফ থেকে মেজর সালেককে উপহার!

সব শেষ করে কোনাবন ফেরত যখন এলাম তখন রাত দুটো।

সকালে উঠে আমি ডা. আখতার, ক্যাপ্টেন কবির আরো কয়েকজন গেলাম শালদা নদী স্টেশন। স্টেশনের পুরো দখল সন্ধ্যায় নিয়েছে ৪র্থ বেঙ্গল। অস্ত্র সংখ্যা বেড়ে গেল। আমাদের এমজি বসেছে, বসেছে এলএমজি পাকিস্তানি বাঙ্কারে। শেষের কয়েকটিতে, দূরে, এখনো পাকিস্তানিরা আছে, যারা পালাতে পারেনি, জখমি। ওরা রেল লাইনের পাশ ধরে পালাতে চাচ্ছে। আমাদের এলএমজি তাদের ফেলে দিচ্ছে পাখির মতো। এমন সময় একজন বেরুলো। এলএমজি গর্জে উঠলো। দুটো ফায়ার করে টার্গেট ঠিক করেছিল এলএমজি ম্যান, পাকিস্তানি সৈনিক দাঁড়িয়ে পড়লো। আস্তে এদিকে ফিরে দাঁড়ালো। অসহায় দৃষ্টি। এলএমজি আবার ফায়ার হলেই ঝাঁজরা হয়ে যাবে সৈনিকটা। ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই পাশে দাঁড়ানো সুবেদার ওহাবের হাত স্পর্শ করলো এলএমজি ম্যানের মাথা। হাতেরই ইশারা বুঝে গেল মুক্তিযোদ্ধা। সুবেদার বললেন, 'যাইতে দে, জখমি!'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম সুবেদারের দিকে। আলম বলতো, ছোটখাটো মানুষটার চেয়ে তার এলএমজি বড়, তার চেয়ে বড় বুকটা। ওটা ভরা সাহস। আমি দেখলাম বড় বুকটায় আরো কিছু আছে, আছে একটি বড় হৃদয়। সুবেদার ওহাব শুধু যোদ্ধা নয়, ওয়ারিয়র।

পনশ্চ : ওদিন রাতে নায়েব সুবেদার বেলায়েতের সঙ্গে কথা হলো। বেলায়েত বলেছিল, স্যার আগামীকাল রাতে টেন্টের সঙ্গে থাকবেন। আমার অনেক কথা আছে।

নায়েব সুবেদার বেলায়েত এসেছিলেন পরের দিন বিকেলে। খবরটা দুপুরেই পাওয়া গিয়েছিল। শালদা নদী যুদ্ধের নায়ক বেলায়েত শহীদ হয়েছেন। ভোরের দিকে বেলায়েত নিজেই কৃষক পোশাকে গিয়েছিলেন নয়নপুরের দিকে 'র‍্যাকি' করতে। তার ইচ্ছে ছিল পাকিস্তানি মোরাল ডাউন থাকতে থাকতেই নয়নপুর দখল করবেন। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে টার্গেট করে ফেলে এবং দূর থেকে মাথায় গুলি করে।

বিকেলে আসার কথা ছিল ভারতীয় জেনারেল সাবেক সিংয়ের। সাবেক সিং শালদা নদী যুদ্ধের বিজয় কাহিনী শুনতে এসেছিলেন। তখনই সৈনিকরা বহন করে এনেছে শহীদ বেলায়েতের মরদেহ। নামানো হলো খাটিয়া। সবাই ডুকরে কেঁদে উঠলো।

শহীদ বেলায়েতের মরদেহ ঢাকা হলো বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে। ব্রিগেডিয়ার সাবেক সিংয়ের নেতৃত্বে সম্মান জানানো হলো শহীদ বেলায়েতকে।

৪র্থ বেঙ্গলের চার্লি কোম্পানির এই কয়েকদিনের যুদ্ধের মধ্যে ঢুকে যাওয়া সুবেদার ওহাব-বেলায়েতের সাহচার্য যেন আমার সংবিত ফিরিয়ে আনলো। এদিকে খবর পেলাম মায়া-ফতেহরা ঢাকা চলে গেছে। আমি গিয়ে ক্যাপ্টেন হায়দারকে বললাম, আমি ঢাকা যাবো।

যুদ্ধের পর প্রথম দেখেছিলাম সুবেদারকে ৩১ জানুয়ারি বা ১ ফেব্রুয়ারি মিরপুর। ভারতীয় বাহিনী মিরপুর শত্রুমুক্ত করতে পারছিল না। তখনও দেশে যৌথ বাহিনী কার্যকর। ওখানে ক্লিন করছিল ২ বেঙ্গল ও ভারতীয় বাহিনী। কিন্তু ৩১ তারিখে ভারতীয় বাহিনী উঠিয়ে নিয়ে ৪র্থ ও ৯ম বেঙ্গলকে আনা হলো কুমিল্লা থেকে। আমি কর্নেল খালেদের সঙ্গে তখনও আছি, অস্ত্র জমা দেইনি। আমরা থাকি ২ নম্বর সেক্টরের থানার দোতলায়। সকালে নিচে নেমে হঠাৎ দেখি ৪র্থ বেঙ্গল নামছে ট্রাক থেকে। সুবেদার ওহাবকে দেখে প্রথম চিনতে পারিনি। আর্মি পোশাক পরা। বুট ঠুকে খালেদকে স্যালুট করলেন। চিনলাম সুবেদার ওহাব।

এরপর বহুদিন কেটেছে। সুবেদারের ওপর লেখা ছেপেছি। কিন্তু ওহাবের সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ একদিন হাবিবুল আলম 'বিচিত্রা' অফিসে আমার রুমে দরজাটা বড় করে খুলে দিয়ে বললো, 'দেখেন তো কে এসেছে, চেনেন কি না!'

দেখি একটা ব্যাগ হাতে সুবেদার ওহাব দাঁড়িয়ে। মুখে চেনা হাসি।

আমি এখানে পুরোটা সুবেদার লিখে গেলাম। কিন্তু ওহাব অনারারি ক্যাপ্টেন হিসেবে আর্মি থেকে রিটায়ার্ড হন। দীঘিনালা ছিল শেষ পোস্টিং। ওখানে কিছু জমি কিনেছিলেন, বাকি জীবন কৃষিকর্ম করে কাটিয়ে দেবেন। এখন আমার কাছে এসেছেন কারণ ওখানে থাকতে পারছেন না। বললেন এখন চাষাবাদ করা যায় না। ওখানে দিনমজুরিতে লোক পাওয়া যায় না। গেলেও দামে পোষায় না। নিজ গ্রাম কুমিল্লায় ফেরত এসেছেন। বললেন, জামিল স্যারের সঙ্গেও দেখা করবেন। এরপর প্রায়ই আসতেন ঢাকা। এলেই হাজির হতেন অফিসে। বিচিত্রা অফিসে একটি বিষয় লক্ষ্য করতাম ক্যাপ্টেন ওহাব, বীরবিক্রম ঢুকলেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতো। বসতে বলে চা খাওয়াতো। চন্দন সরকার বলতো, কোথায় যেন একটা বিরাটত্ব আছে এই ছোটখাটো মানুষটার ভেতর। বিচিত্রা বন্ধ হয়ে গেলে আর মনে হয় দেখা হয়নি। আমার নতুন ঠিকানা হয়তো খুঁজে পাননি। বয়সও হয়েছিল, অসুস্থ ছিলেন। একদিন বলেছিলেন, স্যার আমার ছেলেটিকে একটু বিদেশ পাঠানো যায়?

বাঁচার পথ খুঁজছিলেন সুবেদার। মানুষটি শেষে এসে জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন।

এটাই স্বাভাবিক, এখনকার জীবনযুদ্ধ 'আনফেয়ার ওয়ার'। ঘুষখোর, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, ঋণখেলাপি, রাজনৈতিক লুটেরাদের উত্থান ঘটেছে তারাই সমাজপতি। আন ফেয়ার ওয়ারে বীরবিক্রম ক্যাপ্টেন ওহাবের স্থান না থাকারই কথা।

ক্যাপ্টেন আব্দুল ওহাব, বীরবিক্রম ৭ জুন পরলোকগমন করলেন। কিন্তু সুবেদার ওহাবের বীরত্বগাথা কিংবদন্তির মত চিরকালের জন্য থেকে যাবে এদেশের মাটিতে।

'ক্যাপ্টেন, শেষ সালাম আপনার সহযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে।'

আমাদের হৃদয়ে বাজুক লাস্ট পোস্ট এই ওয়ারিওরের জন্য!

ছবি : **নিউ এজ / তানিম আহমেদ**